এবারেস্ট আজ পৃথিবীর সর্বোচ্চ আবর্জনাস্থল

কল্যাণ নন্দী

হিমালয়ের এক শীতার্ত সকাল। লাদাখের রাজধানী লে শহরে প্রাচীনতম বৌদ্ধমঠ হেমিসে উৎসব উদ্‌যাপনের প্রস্তুতিপর্ব চলছে। বৌদ্ধগুরু পদ্মসম্ভবের জন্মতিথি পালনের বর্ণময় উৎসব মঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীরা উপস্থিত হচ্ছেন প্রাঙ্গণে। কিন্তু এ কী! এক বয়স্ক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী লক্ষ্য করলেন, সন্ন্যাসীদের বসবার স্থান একদল বিদেশি পর্যটকের দখলে। প্রাঙ্গণ জুড়ে শ'খানেকের বেশি বিজাতীয় মানুষের ভীড়। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। কাও মুখে চুইংগাম, কারও হাতে কোকের ক্যান, কারও মুখে সিগারটে। উচ্চগ্রামে কথোপকথন চলছে। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ধীরে পায়ে এগিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনারা সন্ন্যাসীদের বসবার জায়গা ছেড়ে অবিলম্বে এই স্থান ত্যাগ করুণ। উৎসবের লগ্ন আসন্ন। এই পবিত্র স্থান শান্তির আশ্রয়স্থ। এখানে কোলাহল নয়।' বিদেশি পর্যটকের দল হাতে ধরা টিকিট দেখিয়ে সমস্বরে বলল, 'এখানো ঢোকার এটাইতো ছাড়পত্র সুতরাং বেরোবার প্রশ্ন ওঠে না।' বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বিড়বিড় করে বললেন, 'এ তো মানসিক অত্যাচার! নিজেদের উৎসব শান্তিমতো পালন করতে পাব না!

এটি একটি টুকরো ঘটনা। যদিও এই একটি ঘটনাই বলে দিচ্ছে দৃশ্য দূষণ, শব্দ দূষণ, কৃষ্টি দূষণ কী ভাবে হিমালয়ে ছড়াচ্ছে। কীভাবে পরিবেশ বিরুদ্ধ কার্যকলাপ বলপূর্বক প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে।

অথ হিমালয় কথা

যে হিমালয় আজ ভারতের শিয়রে দাঁড়িয়ে তার জন্মসময়ের বিস্তার ছিল তিন কোটি থেকে এক কোটি বছরের কিছু বেশি সময় ধরে। এই জন্ম শুরুর আগে ভূতাত্ত্বিক আলোড়ন, সংকোচন, সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া চলেছিল ৩৫ কোটি বছর আগে। ভূপৃষ্ঠে লাওরেশিয়া' ও গণ্ডোয়ানা ভাগ দিয়ে তুমুল আলোড়ন শুরু। এই লাওরেশিয়া থেকে জন্ম নিল উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়া। এই ইউরেশিয়া ছিল রাশিয়া, চীন আর ইউরোপকে নিয়ে। আর গণ্ডোয়ানা জন্ম দিল অ্যান্টার্টিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত ভূখণ্ডকে। এই বিভাজন প্রক্রিয়া ঘটেছিল ২৮ থেকে ৩৫ কোটি বছর আগে। গণ্ডোয়ানা থেকে দাক্ষিণাত্য তলের উপদ্বীপ অংশ বিভাজিত হল। সেই সময় ভারতীয় তলের অবস্থান ছিল আজকের ম্যাডাগাস্কার ও দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেই তল বছরে পনের সেন্টিমিটার বেগে ভারত মহাসাগরের তলদেশে আড়াআড়ি ভাবে উত্তরে সরতে শুরু করে। এই ধীরে সরণ প্রক্রিয়া ইউরেশিয়া তলের এশিয়া মহাদেশের উত্তরাংশে সংঘর্ষ ঘটায়। আজকের অসমই ছিল সেই সংঘর্ষ স্থল। এই ঘটনা ঘটে এক - দেড় কোটি বছর আগে। সেই প্রবল ভূতাত্ত্বিক আলোড়নে টেথিস সাগর ফুঁড়ে দাঁড়ায় হিমালয়। পৃথিবীর পর্বতশ্রেণীর মানচিত্রে হিমালয় সর্বকনিষ্ঠ কিন্তু উচ্চতায় ও ব্যাপ্তিতে সর্ববৃহৎ। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, ভারতীয় তল এখনও বছরে পাঁচ - ছয় সেন্টিমিটার বেগে সরছে। ফলে হিমালয়ের উত্থান এখনও ধীর লয়ে ঘটে চলেছে।

পশ্চিমে নাঙ্গা শিখর থেকে পূবে নামচা বারওয়া শিখর পর্যন্ত ২৮০০ কিলোমিটার লম্বা আর ২২০ থেকে ৩০০ কিলোমিটার চওড়া এই বিশাল সুউচ্চ ভূমি। ভৌগোলিক সংজ্ঞা এই পর্বতশ্রেণী চার ভাগে বিভক্ত– বহির্হিমালয় বা শিবালিক, মধ্য বা ক্ষুদ্রতর হিমালয়, বৃহত্তর হিমালয় ও ট্রান্স হিমালয়। হিমালয়ের প্রকৃতি অভিনব, বিশাল ও ব্যাপক। এর ভাণ্ডার অফুরন্ত। ভুবিশ্বে মোট ১৫,০০০ উদ্ভিদের মধ্যে ৪,০০০ -এরও বেশি এই হিমায়েই পাওয়া যায়

ভূপৃষ্ঠে বনাঞ্চল সংরক্ষণ ধারা অনুযায়ী পাহাড়ে ৬০ শতাংশ জমি অরণ্য অধ্যুষিত হওয়া উচিত। আর সমগ্র দেশে ৩৩ শতাংশ অরণ্যের উপস্থিতি প্রয়োজন। অথচ ভারতে স্থল ও পাহাড় মিলে আছে মাত্র ১১.৭ শতাংশ। হিমালয়ে ৬০ শতাংশ অরণ্যের বদলে রয়েছে মাত্র ২১.৭৮ শতাংশ। সেখানে ২৮০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সরলবর্গীয় ঘন বনাঞ্চল আজ প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার মুখে। উচ্চতা, তাপমাত্রা ও জলবায়ুর তারতম্যের জন্য পূর্ব হিমালয়, মধ্য হিমালয় ও পশ্চিম হিমালয়ে উদ্ভিদের রকমভেদ চোখে পড়ে। ফুলে ফলে ভরা বর্ণবৈচিত্র্যের নয়নাভিরাম দৃশ্যমালা হিমালয়ের বহিরঙ্গকে আলোকোজ্জ্বল করে রেখেছে। সেই উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা আজ পরিবেশ দূষণে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। পূর্ব হিমালয়ে আদিম অরণ্যে ভরা নেওড়া উপত্যকায় আর ঠিকাদারদের ভীড়। মানুষ আর ধাতব যন্ত্রের দাম্ভিক উপস্থিতিতে গোটা উপত্যকার অরণ্যানী ও প্রাণীকুল বিপর্যস্ত। অরণ্য বিনাশের হার দ্রুত হওয়ায় বর্ণময় অর্কিড শ্রেণী হারিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে দুর্লভ প্রজাতির গাছ-গাছালি। সর্পগন্ধা, একোনাইট হংস, খামালু, প্রিমুলা, লিলি, ম্যাগনোলিয়া, কয়েক প্রজাতির রোডোডেনড্রন—

> **''হিমালয়ের নদীগুলির নিজস্ব স্বাভাবিক ধারা আটকে বাঁধ দেওয়ার কুফল ইতিমধ্যেই ফলতে শুরু করেছে। দেশের মোট ১২০ টি বড় বাঁধের মধ্যে ১০০টিই রয়েছে হিমালয়ের ররি বাঁধ প্রকল্প নিয়ে পরিবেশবিদদের আগাম সর্তকবাণীতে কর্ণপাত না করার ফলে যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হল তার দায়িত্ব কার? ১৯৬৯ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত পূর্ব থেকে পশ্চিম হিমালয়ে যে ভয়াবহ বন্যাও ভূমিকম্প হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধানের ফল কি জানানো হয়েছে ভারতবাসীকে?''**

হিমালয়ের এইসব অমূল্য প্রজাতির উদ্ভিদ আজ অবলুপ্তির প্রান্তসীমায় পৌঁছেছে। হিমালয়প্রেমী মানুষের মুখে শোনা যায়— এই ঘন সবুজ বিচিত্র বনানীর স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে দূরে উত্তুঙ্গ হিমেল রেখার শুভ্রছটা দর্শনে ক্ষুধা চলে যায়, অহংবোধ লুপ্ত হয়, আধ্যাত্মিক অনুশীলন ঘটে, বৌদ্ধিক চেতনায় উত্তরণ হয়।

পৃথিবীতে আনুমানিক ১০,৭৫,০০০ প্রাণের সন্ধান মিলেছে। এই বিশাল সংখ্যার অনেক প্রজাতিরই আশ্রয়স্থল হিমালয়। বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রাণী পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আবার নতুন প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছে। বিগত একশ বছর আগে এই যাওয়া - আসার গতি একটা নির্দিষ্ট নিয়মের বাঁধা ছিল। গত একশ বছর ধরে যাওয়ার গতি মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১০,৭৫,০০০ প্রাণের মধ্যে ৭.৫ লক্ষ প্রাণই হল পোকামাকড় ও খুদে প্রাণী। এইসব কীটপতঙ্গ মনুষ্য প্রজাতির কোনও ক্ষতি তো করেই না বরং নানাভাবে উপকারই করে। পরিবেশ রক্ষায় যে খাদ্য শৃঙ্খল, তাতে এদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে। জীবপিরামিড গঠনে এদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। জীব জগতে অন্যান্য প্রাণীদের বংশবৃদ্ধির অনুপাত আশ্চর্যজনকভাবে আদিকাল থেকে নিয়ন্ত্রাধীন। প্রকৃতিতে কখনই তারা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভাবে না। অথচ এক শ্রেণীর মানুষ হাতে, বাসস্থান ও আহারের সংস্থান করতে অরণ্য নির্বিচারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। প্রাণীদের আশ্রয়স্থল লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই ভূপৃষ্ঠের বুক থেকে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ হেক্টর বনসম্পদ প্রতি বছর উধাও হয়ে যাচ্ছে। হিমালয়ের অফুরন্ত ভাণ্ডার উজাড় করে দেওয়ার এক ভয়ঙ্কর খেলায় মেতেছে অবুঝ মানুষ। প্রাণীজগতের মধ্যে একমাত্র মানুষের

সংখ্যাই কোনও নিয়মনীতির পরোয়া না করে অস্বাভাবিক গতিতে বেড়ে চলেছে। এই দ্রুত বংশবৃদ্ধির ধাক্কায় পরিবেশ আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে। মানুষই আজ প্রকৃতির সব থেকে বড় শোষক ও খাদক। অনুসন্ধানে যে সব প্রাণীদের অস্তিত্ব ভীষণভাবে বিপন্ন, সেইসব দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর মধ্যে আছে দুটি লেঙ্গুর শ্রেণীভুক্ত প্রাণী। এর মধ্যে সোনালি লেঙ্গুরের অবস্থা বেশ সঙ্গীন। হিমালয়ের তিব্বতে, লাদাখে ও সিকিমে একধরনের বন্য গাধার (এশিনাস কিয়াও) অস্তিত্ব কমে আসছে। বিপদগ্রস্তদের মধ্যে রয়েছে— ডুয়ার্সের খুদে শূকর, হিমালয়ের বিখ্যাত কস্তুরীমৃগ, কৃষ্ণসার মৃগ, হিমালয়ান মাস্ক মৃগ, সাঙ্গাই মৃগ, কাশ্মীর ও হিমাচলের এক বিশেষ জাতের শিংওয়ালা হরিণ, স্নো লেপার্ড, এক শিঙা গণ্ডার, বুনো মোষ, বুনো ইয়াক, বিভিন্ন প্রজাতির বন্য ভেড়া, বিশালাকৃতি সোনালি ঈগল, দাড়িওয়ালা শকুন, বাদামী ভল্লুক, কুমায়ুন অঞ্চলের এক প্রজাতির হুনুমান যাদের গোটা শরীর সাদা কেবল মুখটি কালো। এক বিশেষ প্রজাতির চিনাত বাঘ, তুষার চিতা, ছোট একশিঙা গণ্ডার, গোলাপী মাথাওয়ালা হাঁস, পাহাড়ি ডাহুক — এরা একেবারে লুপ্ত তালিকায় চলে গেছে। বিশ্বে আনুমানিক ১০,০০০ প্রজাতির পাখির মধ্যে ১৪ শতাংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে এই শতকের মধ্যে।

ভারতীয় প্রাচীন পুঁথিতে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কথা বলা আছে। প্রাণী হত্যা মহাপাপ, এও বলা আছে। যজুর্বেদে, চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে রয়েছে অভয়াশ্রমের কথা। 'মাভৈ' কথাটির অর্থ ভয় পেও না। সম্রাট অশোকের শিলালিপি থেকে জান যায় যে রাজাজ্ঞায় প্রাণীদের অভয়দানের কথা রয়েছে। প্রাচীন মুনি - ঋষিদের আশ্রমে মানুষ আর অন্যান্য প্রাণীদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল। ১৮৮৭ সালে সরকারি আইন জারি হয়। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ৪৮, ৫১ ধারায় উল্লেখ আছে বন, বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সুরক্ষার কথা। রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে ১৯৭২ সালে পরিবেশ সুরক্ষার প্রয়োজনে ২৬ অনুচ্ছেদের এক দলিল প্রকাশিত হয়। সেই ঘোষণাপত্রের চতুর্থ অনুচ্ছেদে বলা আছে— প্রতিকূল অবস্থার চাপে বন ও বন্যপ্রাণীকুলের অস্তিত্ব বিপন্ন, সুনির্দিষ্ট পরিচালনব্যবস্থার মাধ্যমে এদের সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। মানুষ আবার মাঝে মধ্যে নিজেকে প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী বা তার থেকেও বড় পণ্ডিত ভেবে নিচ্ছে। ফলে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে এমন সব কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে যার ফলে আখেরে ভাল হচ্ছে না। আজ পৃথিবীতে মাত্র ৭ শতাংশ অঞ্চল ক্রান্তিয় অরণ্য দ্বারা আবৃত। উন্নত দেশগুলিতে এই অরণ্য কমে গেছে। যা আছে তা কেবল উন্নয়নশীল বা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে (তার মধ্যে হিমালয় পড়ে)। তাদের হাতে জৈব প্রযুক্তি আর পরীক্ষা - নিরীক্ষার রস আমাদের জিম্মায়। উন্নত দেশগুলি নিজেদের স্বার্থে বিভিন্নরকম সংস্থা, সংগঠন তৈরি করে চাপ দিচ্ছে যাতে উন্নয়নশীল অনুন্নত দেশগুলি প্রয়োজনীয় কাঁচা রসদের যোগান ও সরবরাহ ঠিক রাখে। তারা এও চায় যে জীন, জীবকোষ নিয়ে নানা পরীক্ষা - নিরীক্ষার মাধ্যমে উন্নত ধরনের বীজ, ওষুধ তৈরি করে ভোগবাদী উন্নত দেশগুলি অধিক অর্থের মুনাফা লুঠতে পারে। কোনও প্রযুক্তি হস্তান্তর নয়, পরীক্ষার ফলাফল ভাগাভাগি নয়, শুধুমাত্র রসদের যোগানদার হও।

দীর্ঘকাল ধরে যে সাবেকি প্রথায় হিমালয়ে চাষাবাদ হয়ে আসছিল তা আজ পরিবর্তনমুখি। পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব হিমালয়ে সমতল ভূমির মতো করে চাষাবাদ চলছে। সমতলের জমি ও পাহাড়ের জমি— একই দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। গরিব হিমালয়বাসী সেই চাপের কাছে নতি স্বীকার করছে মূলত অধিক ফলন ও বাড়তি লাভের আশায়। অপরিমেয় চাহিদার প্রয়োজনে প্রতিদিনই নির্বিচারে গাছ-গাছালি বধ চলছে। চাষের জমির বিস্তার ঘটছে। ব্যাপক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে। অনেক রাসায়নিক মৌলর ভাঙন নেই। ফলে তা সরাসরি মৌল উপাদান হিসেবে খাদ্যের সঙ্গে শরীরে ঢুকে যায়। কীটনাশক পদার্থগুলি বৃষ্টিতে ধুয়ে পৌঁছে যায় ঝর্ণার স্রোত ধরে সরাসরি নদীতে। এই বিষের সংস্পর্শে এসে বায়ো - অর্গানিজম, লিভিং - অর্গানিজম -এর অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন। তাই বিশেষজ্ঞরা এখন কীট দমনের পুরনো পদ্ধতির কথা বলছেন। আসলে কী হয়, কীনাশকের মধ্যে ক্লোরিনেটেড হাইড্রোজেন ও বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড যে কোনও প্রাণীর শরীরে ঢুকে ক্রোমোজমের জীবন প্রকৃতি পাল্টে দিতে পারে। এইভাবে হিমালয়ের নদীগুলি নানা বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থের জন্য দুষিত হচ্ছে।

গাড়োয়াল হিমালয়ের চাম্বা জেলায় ভাগীরথী, ভিলঙ্গনা উপত্যকায় যে সবুজ অরণ্যানী তিরিশ বছর আগেও ছিল তা আজ সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে গেছে। এখন শুধু রয়েছে ন্যাড়া বাদামি পাহাড়। তেহ্‌রির অবস্থা আরও ভয়াবহ। তেহ্‌রি বাঁধ প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে এখানকার সব কিছু ধূলিসাৎ হয়েছে। পরম যত্নে লালিত ঐ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বলিপ্রদত্ত হয়েছে নগর সভ্যতা নামক তত্ত্বের কাছে। এই অমূল্য সম্পদ কোনও মূল্যেই আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। আজন্ম হিমালয় প্রেমিক বহুগুণা প্রশ্ন রেখেছেন—'প্রকৃতির কি নিজের মতো বেঁচে থাকার অধিকার নেই? উন্নয়নের দোহাই দিয়ে প্রকৃতিকে নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলার অধিকার একদল বিবেকহীন মানুষকে কে দিল?'

অশনি সংকেত

হিমালয়ের অফুরন্ত অমূল্য ভাণ্ডার উজাড় করার যে ভয়ঙ্কর খেলায় সামিল হয়েছে একদল মানুষ, তা প্রতিরোধ করতে জীবন বাজি রেখে এগিয়েছিলেন একদল গ্রাম্য হিমালয়বাসী। সুন্দরলাল বহুগুণার নেতৃত্বে 'চিপকো' আন্দোলনের কথা আমরা জানি। প্রাথমিক পর্যায়ে পুরুষেরা নয়, গ্রাম্য রমণীরাই হটিয়ে দেয় ঘাতকবেশী ঠিকাদারদের। গাছকে কুঠারের স্পর্শ থেকে বাঁচাতে দু'হাতে গাছকে জড়িয়ে ধরে ওরা। সেই অভিনব প্রতিরোধের ফলে পিছু হটতে বাধ্য হয় নৃশংস ঘাতকবাহিনী। সেই শুরু। উত্তরাখণ্ডের গ্রামে গ্রামে আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। 'চিপকো' কথার অর্থ 'জড়িয়ে ধরা'। এই আন্দোলনের ঢেউয়ে গাড়োয়াল হিমালয়ের বনাঞ্চল নিশ্চিহ্ন হওয়ার মাত্রা খানিকটা হ্রাস পেয়েছে। অবশ্য এই আন্দোলন তেহ্‌রি বাঁধ প্রকল্পকে ঠেকাতে পারেনি।

হিমালয়ের নদীগুলির নিজস্ব স্বাভাবিক ধারা আটকে বাঁধ দেওয়ার কুফল ইতিমধ্যেই ফলতে শুরু করেছে। দেশের মোট ১২০ টি বড় বাঁধের মধ্যে ১০০ টিই রয়েছে হিমালয়ে। হরি বাঁধ প্রকল্প নিয়ে পরিবেশবিদদের আগাম সতর্কবাণীতে কর্ণপাত না করার ফলে যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হল তার দায়িত্ব কার? ১৯৬৯ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত পূর্ব থেকে পশ্চিম হিমালয়ে যে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিকম্প হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধানের ফল কি জানানো হয়েছে ভারতবাসীকে? এটা বুঝতে হবে, তেহ্‌রি থেকে তেওড়া প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের অর্থ ভৌগোলিকভাবে স্পর্শকাতর হিমালয়ে সাদরে ভূকম্পনের মাত্রা বাড়ানো। হিমালয় তো সৃষ্টির আদিকাল থেকে ছিল না। যে ঊর্ধ্বমুখী চাপ উত্তরমুখী সরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল তা এখনও স্থিতিশীল হয়নি। এই চলমান অস্থিরতার দারুণ হিমালয়ের বিস্তৃত এলাকা ভূকম্পন প্রবণ হিসেবে চিহ্নিত। সেই কারণে বিভিন্ন শিলাস্তরের বিন্যাসে স্থানচ্যুতি ঘটে চলে প্রতিনিয়ত। এর ওপর ব্যাপক অরণ্য ধ্বংস, রাস্তা নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ জনিত কারণে ভূপৃষ্ঠে অস্বাভাবিক কৃত্রিম চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এই ঘাতজনিত কারণে ভূগর্ভস্থ শিলাস্তরের বিন্যাসে বিচ্যুতি দেখা দিচ্ছে। কম্পন সৃষ্টি হচ্ছে, ধ্বস নামছে। রাশি রাশি বালি, পাথর, মাটি গড়িয়ে নামছে তিস্তা, মাথাভাঙা, অলকানন্দা, মন্দাকিনী, ঋষিগঙ্গা, পাতালগঙ্গা, বিরহী, সরযু, পিণ্ডার ও গৌরী গঙ্গায়। এই বিশাল পরিমাণ পলি নদীগুলি ধরে রাখতে পারছে না, নিম্নমুখী হয়ে জমছে বাঁধে। ফলে, নদী ও বাঁধের গভীরতা হ্রাস পাচ্ছে। প্রবল বৃষ্টির সময় ভয়াল জলস্ফীতি ঘটে বন্যার সৃষ্টি

করছে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, হিমালয়ের ৬৫ শতাংশ ভূমি আজ ক্ষয়রোগে ভুগছে। ফলে, গোটা উপমহাদেশেই জৈব বৈচিত্র্যে আঘাত নেমে এসেছে। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত যে হারে ভূকম্পন হয়েছে হিমালয়ের বুকে তা কিন্তু ভয়াবহ ইঙ্গিত করছে। এই ভূকম্পন স্থায়ী হচ্ছে ৩০ সেকেণ্ড দরে যার পরিমাণ রিখটার স্কেল অনুযায়ী ৬.৩ থেকে ৬.৮ পর্যন্ত।

প্রকৃতির চরম আঘাত মাঝে মাঝে হিমালয়বাসীদের ওপরও নেমে আসে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৯৭ -এর মধ্যে এক পশ্চিম হিমালয়েই মোট এগারোবার ভয়াবহ হিমানী সম্প্রপাত হয়েছে। আড়াই হাজার কিলোমিটারের বেশি রাস্তা হিমানী সম্প্রপাত প্রবণ এলাকা দিয়ে গেছে। বিশাল শক্তি নিয়ে যখন সম্প্রপাত নামে তাকে বাধা দেওয়া বা গতি কমিয়ে দেওয়ার জন্য যে গাছ - গাছলি থাকা দরকার তা নগর সভ্যতার কল্যাণে উধাও। ফলে, ওই বরফের ঢল এসে সরাসরি পড়ছে ক্ষেত বা বসতির ওপর। পূর্ব হিমালয়ের অরুণাচল প্রদেশে তাও বা কিছু অরণ্য আছে, বাকী অংশে বন লুণ্ঠনের ব্যাপকতার ফলে ডুয়ার্সের লাটাগুড়ি, বিনাগুড়ি, চিলাপাতা, চাপড়ামারি, বক্সা, জয়ন্তির জঙ্গল আজ সূর্যের আলোয় আলোকিত। তিন দশক আগেও এই জঙ্গলে ঢুকতে গা ছমছম করত।

অবাধে কাছ কাটার ফলে আমরা নিজেদের যে কী ক্ষতি করছি তার একটি অর্থমূল্যের হিসাব উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, একটি পঞ্চাশ বছর বয়স্ক গাছ থেকে আমরা পাই — অক্সিজেন সরবরাহ, জৈব প্রোটিন সৃষ্টি, আর্দ্রতা, জলচক্র নিয়ন্ত্রণ, ভূমিক্ষয় রোধ, পশু - পাখি ও ছোট গাছের আশ্রয়দান, দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা ইত্যাদি। এসবের মোট অর্থমূল্য ১৫ লক্ষ্য ৭০ হাজার টাকা। অক্সিজেনের পরিমান কমে কার্বন - ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য ক্ষতিকারক গ্যাস বেড়ে গিয়ে বাতাসে দূষণের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। ক্ষতিকারক রাসায়নিক অক্সসাইডগুলি জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশে অ্যাসিড ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। এই অক্সাইডগুলি বাতাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করে শ্বাসযন্ত্রের রন্ধ্রে শোষিত হয়। ফুসফুস সংক্রামিত হয় টিবি, ব্রঙ্কাইটিস, অ্যাজমা, ক্যানসার জাতীয় ব্যাধিতে। কেউ কেউ বলেন, গাছ কাটা হচ্ছে বটে আবার রোপণও তো করা হচ্ছে। তা হচ্ছে, তবে প্রকৃতির নিয়মবিধি না মেনে। সমতলে যেমন শালের জঙ্গল কেটে আকাশমণি গাছ রোপন করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য একই। এগুলো যেহেতু লাভজনক গাছ তাই ব্যবসায়িক প্রয়োজনে চাই দ্রুত বৃদ্ধি, দ্রুত লাভ। বড় গাছের শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত থাকে বলে তাদের মাটির ধারণের ক্ষমতাও বেশি। আর এইসব গাছের শিকড় ততটা ছড়ায় না। উপরন্তু এদের ভূগর্ভস্থ জল শোষণের ক্ষমতা বেশি। ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর কমে যাচ্ছে, ঝর্ণা শুকিয়ে যাচ্ছে। হিমালয়ে নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংসের জন্য মাটির ক্ষয় ব্যাপক হারে ঘটছে। সারা ভারতবর্ষে এই ক্ষয়ের পরিমাণ আতঙ্কিত হওয়ার মতো ঘটনা। একটি হিসেবে অনুযায়ী, প্রতি বছর ৮০০০ হেক্টর জমির উপরিতলের মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। অথচ মাটির মাত্র ১ সেন্টিমিটার উপরিভাগ তৈরি হতে সময় নেয় আনুমানিক ১০০ থেকে ৪০০ বছর।

২০০২ সালকে 'পর্বত বছর' হিসেবে পালন করল সারা বিশ্ব। বিষয়টি অবশ্যই শ্লাঘার। কেননা মানুষের স্বার্থে পাহাড় বাঁচানোর জন্য কিছু কঠোর অনুশাসন ও প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালনে চাই সততা, প্রত্যয় ও বৌদ্ধিক চেতনা। হিমালয় দূষণের আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে বিভিন্ন পর্বতাভিযান, সীমান্তবর্তী এলাকায় সামরিক উপস্থিতি। প্রতিবছর প্রায় চার লক্ষ মানুষ হিমালয়ের অভ্যন্তরে যান। এর মধ্যে প্রায় দু হাজার পর্বতারোহী বিভিন্ন শিখর অভিযানে অংশ নেন, আর প্রায় ৫০,০০০ পদযাত্রী পায়ে হেঁটে হিমালয়ের আনাচে কানাচে ভ্রমণ করেন। বিখ্যাত পর্বতারোহী ব্যারি ডি বিশপ এভারেস্ট আরোহণ করার পর বলেছেন — এভারেস্ট আজ পৃথিবীর সর্বোচ্চ আবর্জনাস্থল। অভিযানকালে ব্যবহৃত তাঁবু, খাদ্যের অবশিষ্টাংশ, খাদ্যের টিন, দড়ি, পলিথিন, প্লাস্টিকের বোতল, ওষুধের ফয়েল, ব্যাণ্ডেজ, কাগজ ও ভারবাহী পশুর মৃতদেহ যত্রতত্র পড়ে থাকতে দেখা গেছে। এই এভারেস্টের আবর্জনা পরিষ্কার করতে দু-দুবার অভিযান হয়েছে। এরকম একটি অভিযানে তিনবারের এভারেস্ট বিজয়ী অভিযাত্রী ফু দোরজি হিমানী সম্প্রপাতে আঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন। পর্যবেক্ষণে জানা গেছে, এভারেস্টের বুকে জমে আছে প্রায় পঞ্চাশ টন আবর্জনা। প্রতিটি পর্বত শিখরে ওঠার পথে এরকম আবর্জনার স্তূপ দেখা যাবে। সুতরাং অভিযাত্রী দলগুলিকে কঠোর অনুশাসনে বাঁধতে না পারলে ঐ উচ্চতায় দূষণ রোধ করা সম্ভব হবে না। সিয়াচেন হিমবাহ অঞ্চলে ভারত ও পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর উপস্থিতির ফলে প্রতিদিন আবর্জনার পাহাড় জমছে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা প্রশমিত না হলে আগামী দিনে এই দূষণের মাত্রা আরও বাড়বে।

সকলকে নিয়েই বাঁচতে হবে

শুরুতে মানুষ কখনই প্রকৃতি থেকে নিজেকে বিযুক্ত করেনি। প্রাচীন ঋষিদের মতো, আলো, বাতাস, জল, ভূমি, এক নির্দিষ্ট নিয়মে পিতৃ-মাতৃ স্নেহে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে যার ফলশ্রুতিতে জীবমণ্ডল পরম নিশ্চিন্তে জীবনধারণ করছে। এই ভাবনা, এই তত্ত্বের কথা এখন অনেকে বলছেন। একেই বলা হচ্ছে 'গেইয়া' বা 'গোয়া' তত্ত্ব। এটি গ্রিক শব্দ। পৃথিবীকে মাতৃরূপে কল্পনা করা হয়েছে। গ্রিকে যা কেইয়া বা গেয়া, সংস্কৃতে তা গো। জীবের প্রাণরক্ষায় জড়বস্তু সকল প্রতি মুহূর্তে পরম দক্ষতায় প্রয়োজনীয় কর্ম করে চলে। আমরা বুঝতে চাই বা না চাই, এটাই পরম সত্য। নির্জীব বস্তু যেমন নির্ভরতা দেয়, তেমন তারও সজীবের কাছ থেকে সহযোগিতা প্রাপ্য। এই ভারসাম্য সামান্য টাল খেলে পরিবেশে নেমে আসবে অস্থিরতা। আজকের পরিবেশ - চিত্রটি যে মলিন তার জন্য একক ভাবে দায়ী মানুষই।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ভাসমান কার্বন-ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাসীয় কণা সূর্যালোক থেকে আগত তাপের ধারকের কাজ করে। কার্বন-ডাই অক্সাইড, কার্বন - মনোক্সাইড, সালফার - ডাই অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদির পরিমাণ ভূমণ্ডলে যত বাড়বে ততই তাপ ধারণের ক্ষমতা বাড়বে। ধরিত্রী উত্তপ্ত হবে। এখন বায়ুমণ্ডলে কার্বণ-ডাই অক্সাইডের পরিমাণ আছে ৩৭৯ পার্টস প্রতি মিলিয়ন। এই সংখ্যা ৪০০ -তে পৌঁছলে পৃথিবীর তাপমাত্রা এমন জায়গায় পৌঁছবে যে মেরু প্রদেশের বিপুল বরফরাশি গলতে শুরু করবে, পৃথিবীতে জলরাশির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে যার অর্থ মহাপ্লাবন। বিজ্ঞানীরা সাবধানবাদী দিয়েছেন, যদি কার্বন- ডাই অক্সাইডের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তাহলে পনের বছরের মধ্যে পৃথিবীতে বিপর্যয় নেমে আসবে। পাশাপাশি, নাইট্রাস অক্সাইড ও সালফার ডাই - অক্সসাইডের বৃদ্ধির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ না করলে ঊর্ধ্বাকাশে ভাসমান ওজোনের স্তর হাল্কা হতে শুরু করবে। সূর্য থেকে নির্গত অতি বেগুনি রশ্মি, লাল উজানী রশ্মি ও অন্যান্য ক্ষতিকারক রশ্মি ধেয়ে আসছে এই পৃথিবীর বুকে। ওজোনের স্তর যত হাল্কা হবে ততই বৃদ্ধি পাবে এই রশ্মির ভূপৃষ্ঠকে আঘাত করার শক্তি। এই ওজোন নামক নির্জীব গ্যাস ভূমণ্ডলের স্ট্রাটোফিয়ারে বিরাজ করে। ভূপৃষ্ঠের পনের থেকে ষাট কিলোমিটার বা তারও ওপরে ভেসে থাকে এই গ্যাসীয় পদার্থ। এই সমস্ত গ্যাসীয় পদার্থ জড়ো করলে তা হবে তিন মিমি পুর। এই স্তরই ভয়ানক রশ্মিগুলির গতিপথ রুদ্ধ করে জীবজগকে রক্ষা করে চলে। এই গ্যাসীয় স্তর গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হয়নি। মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে সকলকে নিয়েই তাকে বাঁচতে হবে। গোটা পৃথিবী আজ বিপর্যয়ের প্রান্তসীমায় উপস্থিত। এই বিপর্যয়ের মুখে মানুষ আজ সততই আসামীয় কাঠগোড়ায়।